Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501007 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

‘Praner Nisses Preme (In Love That Consumes the Soul…,)’: Amiya Chakravarty
‘প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে…’: অমিয় চক্রবর্তী

Dr. Sujay Kumar Maity
Associate Professor
Bengali Department, Raja Narendra Lal Khan College
West Medinipur

Received on: 28th February 2026
Accepted on: 06th March 2026

Abstract:
The inner world of the poet Amiya Chakravarty was profoundly stirred by the impact of contemporary domestic and international political events. He perceived the restless turbulence pervading the globe through the lens of his poetic sensibility, grounded in experiences born of absolute integrity. Distressed by the atrocities inflicted by humans upon one another — and by the degradation of human dignity at human hands — he composed numerous poems. Ultimately, with a serene spirit, he accorded the highest priority to the principles of humanism and love for humanity.

Key Words:
Illumination, crisis-born, vitality, unappreciated, sincere, empathy, vision, fratricide, receptiveness.

মূল প্রবন্ধ

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থের ‘অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল’ প্রবন্ধের প্রথমেই একটি মন্তব্য করেছেন:

“সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত, আর সেই হিসেবে প্রত্যেক কবিরই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে; কিন্তু আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে ‘আধ্যাত্মিক’ কথাটি প্রয়োগ করতে চাই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ’য়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সব চেয়ে কম।”[১]

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর বা ধর্মসম্বন্ধীয় কোন্ অর্থে ‘আধ্যাত্মিক’ কথাটিকে তিনি অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে প্রয়োগ করতে চান নি। তিনি ‘বৈদেহিকতার ব্যাপ্তি’ ও ‘রক্তমাংসের আক্রমণের’ অভাবকেই এখানে আধ্যাত্মিকতা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। একথা সত্য যে, অমিয় চক্রবর্তীর বহু কবিতায় আন্তর অনুভূতির প্রকাশ ও চৈতন্যের উদ্ভাসনা লক্ষ করা যায়। সেই কবিতাগুলিতে হয়তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বা সার্বিকভাবে অনুভব গ্রাহ্যতার অংশ নগণ্য এবং সেইসব কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যের বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি উঠবে না। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর অজস্র কবিতা আছে, যেখানে কাব্যরূপ লাভ করেছে বাস্তব বর্ণনার টুকরো ছবি, অনেকানেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনার সংঘাত, তাঁর মানস অনুভূতির বহুস্তরীয় রূপ ও স্বরূপ

© Santiniketan Sahityapath

তথা রূপনির্মাণের বিশিষ্ট কোণ (angle)গুলি। এই জাতীয় কবিতাগুলি তাঁর কবিকর্মের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর অভিমতটি খাটে না। আমাদের আলোচনার পরিসরে রয়েছে সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে অমিয় চক্রবর্তীর মানস-অনুভূতির স্বরূপ বিশ্লেষণের দিকটি। সেখানে দেখা যাবে কবির প্রত্যয়ের আর একটি অনন্য দিক।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবী জুড়ে যে দামামার সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব সমগ্র সমাজ-সভ্যতা-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির উপর পড়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তীকালের পটভূমিতে মহৎ কবি-দৃষ্টিতে জন্ম নিয়েছে দু’একটি অনন্য জীবন-প্রত্যয়ী ভাবনার। সেইসময় জীবনানন্দ খণ্ডিত পৃথিবীর বিষণ্ন চেতনাকে বহন করলেন তাঁর কবিতায়। ১৯৪৬-৪৭এর প্রেক্ষাপটে সংঘটিত নানান রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর কবিতায় মিশে যেতে দেখা যায়। আগাগোড়াই তাঁর কবিতায় মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটা বাতাবরণ লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় তো বিশ্বমানবের রাজনৈতিক ও মানসিক সংকটজাত হতাশার নানা ছাপ দেখা যায়, লক্ষ করা যায় বিশ্বসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে সাম্যবাদী কবিদৃষ্টি। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও মার্কসবাদী রাজনৈতিক চেতনার ছাপ প্রকাশ পেল। যুদ্ধ-পরবর্তী মানুষের শূন্যতাবোধ ও গ্লানি আরো স্পষ্ট আকার নিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়। বিশ্ব-রাজনীতির সামগ্রিক নির্মমতা তাঁর ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থে কাব্যায়িত হলো। আর অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় পরিস্ফুট হ’লো পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মননের ক্ষয়, জীর্ণতা ও জটিলতা। আবার তারই মাঝে তিনি শান্তি ও সেবার, বিস্ময় ও মিলনবোধের সজীবতাকে প্রকাশ করলেন। আসলে তিনি তৎকালীন বিশ্বের সচল প্রেক্ষাপটে শুভ প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে, মানবতাবাদের কল্যাণ-বিশ্বাসে আস্থা রেখে সমগ্র পৃথিবী ও সামগ্রিক মানবজাতিকে সমদর্শী দৃষ্টিতে অন্তরে গ্রহণ করেন। মানুষের প্রতি প্রীতিতে ও বিশ্বাসে গড়ে উঠল তাঁর কল্যাণাদর্শের বৃষ্টি। যাকে কবির আন্তর্জাতিক চেতনা বলা যেতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে অমিয় চক্রবর্তীকে সরাসরি রাজনৈতিক কবি বলা যাবে না। তাঁর কবিতায় যেটুকু রাজনৈতিক ভাবনা এসেছে তা হয়েছে তাঁর মানব-নীতির পরিচায়ক। তবে তিরিশের দশকের অন্যান্য মহৎ ব্যক্তির মতোই তাঁর অন্তরেও বিশ্বের নানা রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর চেতনাকে আলোড়িত করেছে।

অমিয় চক্রবর্তীর শৈশবাবস্থা আসামের একটি ছোটো অঞ্চলে অতিক্রান্ত হলেও তাঁর বাল্যশিক্ষা ও মানসগঠন নির্মিত হয়েছে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত পরিবেশে। তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ ছিল ভ্রমণময়। প্রথম যৌবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয়তায় আকৃষ্ট হলেন। শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসে তিনি মুগ্ধ হলেন এক ডেনমার্কের কন্যার ব্যক্তিত্বে। তিনি সহজে লাভ করলেন বিদেশ-যাত্রার সুযোগ। একদিকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার নানা দেশে। অন্যদিকে গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি গেছেন বিহার ও নোয়াখালি। আরো বিভিন্ন সময়ে তিনি ঘুরে এসেছেন মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ও কোরিয়া। এই সচল জীবনের মাঝে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর আত্মদৃষ্টি, প্রাণের অনিঃশেষ প্রেমের দৃষ্টি। মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার পেছনে আছে তাঁর মানবপ্রীতি ও মানবিক দৃষ্টি। তাই তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন চেতনার সঙ্গে সংলগ্ন এক অনন্য প্রত্যয়। এক হিসেবে একে বলা যায় তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনার এক অনন্য অংশ।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সময় সীমায় অমিয় চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ থেকে কবি হয়েছেন মার্কিন-প্রবাসী। এই আট বছরের কালবৃত্তে ভারতভূমিতে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। ১৯৪১এ রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন লোকান্তরিত। ১৯৪২এ শুরু হলো ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩এ বাংলায় ঘটেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৯৪৫এ পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটেছে অবসান। ১৯৪৬এ বাংলায় ঘটেছে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস তাণ্ডব। ১৯৪৭এ দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটেছে। ১৯৪৮এ নাথুরাম গডসের গুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক, সত্য অহিংসার জীবন্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান ঘটেছে। এই মহাদুর্যোগময় দিনগুলিতে অমিয় চক্রবর্তী মহৎ শিল্পী হিসেবে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। মন্বন্তরের মর্মান্তিকতাকে তিনি কাব্যায়িত করেছেন তাঁর কবিতায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মৃত্যুভীত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজীর শান্তি পদযাত্রায় সামিল হয়ে, নোয়াখালিতে, বিহারে ও অন্যান্য উপদ্রুত অঞ্চলেও গিয়েছেন তিনি। যদিও কবির ক্ষেত্র রাজনীতি নয়। পরবর্তীকালে তিনি রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। ১৯৭১এর জুলাইয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি অ্যান্ড্রুজ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির মূল সুর সেবার, করুণার ও মানবিকতার। তাতে আছে আফ্রিকার নির্যাতিত, উপেক্ষিত ও অনাদৃত মানুষের কথা, আছে ওড়িশার বন্যা ও পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ।

তারুণ্যে দীপ্যমান বয়স থেকেই অমিয় চক্রবর্তীর দেশপ্রীতি ছিল গভীর এবং তাঁর মধ্যে ছিল প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ। পরাধীনদেশের মানুষ হিসেবে তিনি কখনোই হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেননি। এবিষয়ে দু'একটি প্রসঙ্গ স্মরণীয়। কুড়ি বছর বয়সে তিনি একবার শিলং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে কোনো একটি রাজপথ থেকে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী তাঁকে সরে যেতে বলে — সে পথ 'নেটিভ'দের ব্যবহারের জন্য নয়। কবি তার জবাবে গভর্ণর মি. মরিসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন প্রতিবাদ জানিয়ে। পরবর্তীকালে মি. মরিস দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।[২] আর একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৭৮এর ১১ মে-তে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন:

"শান্তিনিকেতনে তখন ছিলাম না, কলকাতায় ঘটনাটা ঘটে। 'পীড়ন' ঠিক নয়, কিন্তু অসম্মানটাই অসহ্য হয়েছিলো। G.P.O.তে পার্সেল পাঠাতে গিয়ে — পুলিশের ধাক্কা খেলাম। যেন আমি 'লাইন' ভেঙেছি, যদিও আমি শান্ত হয়ে আমার অবসরের অপেক্ষা করছিলাম। কর্মচারী রূঢ় ভাষায় বলল সরে যাও। আমি সরলাম না। তখন সে আমাকে কয়েদির মতো টেনে নিয়ে গেল, ডালহৌসী স্কোয়ারের অপর দিকে একটা থানায়। সেখানে চোর এবং অন্য নানা প্রকারের আসামীর সঙ্গে দাঁড়াতে হল। ছাড়া পেলাম, কিন্তু অভিজ্ঞতাটা নিদারুণ।"[৩]

পৃথিবীর নাশকতামূলক স্বরূপ কবিকে বিচলিত ও আহত করেছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "সমগ্র মানববসুন্ধরায় একটি অন্ধযুগ আবর্তিত হচ্ছে সন্দেহ নেই। এমনতরো বিশ্বচারী হন্যতা ইতিহাসের রঙ্গালয়ে দেখা যায় নি। শহরে পল্লীপ্রান্তে বিষধূম্র ছড়িয়ে গেল জাতির নামে, ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের মারণ মত্ততায় আজ সংসার শতছিন্ন।"[৪]

কবির এই বক্তব্যে তেমন কোনো উত্তেজনা বা তীব্রতা প্রকাশ না পেলেও এর মধ্যে যে নির্মম সময়ের বিপন্নতাবোধ তাঁর মননকে বিচলিত করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে পীড়িত মানুষ তাঁর সহমর্মিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে তাতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনতিসোচ্চার আন্তরিক অনুভব। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ও জাতির সংস্পর্শে এসে দেখেছেন সর্বদেশের মানুষের বেদনার আর্তির ছবি। পৃথিবী-জোড়া ক্ষত চিহ্নগুলির উপর কবির ব্যথিত দৃষ্টি পড়েছে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে মানবনীতির ভাবনা রয়েছে, তাকে অমিয় চক্রবর্তীর মহৎ রাজনৈতিক দৃষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, মানুষের হাতে মানুষের অত্যাচারের রক্ত-রেখাঙ্কিত ছবি দেখে কবি 'একমুঠো' কাব্যের 'যুদ্ধের খবর' কবিতায় বলেছেন:

"সংহার
সিন্ধুতীরে দাঁড়াই আজ, উন্মাদ সংসার
রুধির তরঙ্গে ভাসলো, দীর্ণ মৃত্যুর হাহাকার
সভ্যতার অন্ধকারে।"[৫]

কিংবা বলেছেন:

"কান্নার ঢেউ উঠলো-
পাপ দিয়ে গড়া বাঁধ টুটলো।
এই বন্যায়
স্বাজাতিক রাষ্ট্রের অন্যায়
ভিৎ-ভাঙা ভাসবে,
যুক্ত দেশের দিনে আসবে
বাঁচবার শ্রদ্ধায়
নির্লজ্জ বাঁচবার অধ্যায়।
মরলাম, মারলাম-চীৎকার গর্ব
লজ্জিত জীবনের পর্ব
রেডিয়ো বন্ধ ক'রে চ'লে আসি:
নির্যাতিত দেশ, জলমগ্ন শিশু, উপড়ে-ফেলা গ্রামবাসী

© Santiniketan Sahityapath

দাও স্বত্ব, দাও স্বত্ব,
মানুষকে মনুষ্যত্ব।”[৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কলকাতার পথে পথে তখন কঙ্কালসর্বস্ব মানুষের মিছিল। আধুনিক সভ্যতার এই চরম ঔদাসীন্য কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে। তিনি এই মিছিলের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর পরিকীর্ণ শবের মহাশ্মাশানে বসে পাঁচটি কবিতা লিখলেন। ‘অন্নদাতা’, ‘অন্নদাও’, ‘১৩৫০’, ‘দূরের ভাই’ ও ‘নিমন্ত্রণ’ সেই কবিতা ‘পঞ্চক’। কবি একেবারে মিততম ভাষণে আন্তর্জাতিক কূটনীতির নিষ্ঠুর, চতুর হিসেবি চেহারাটাকে এই কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অন্নরিক্ত নরনারী যখন মহানগরীর বুকে শেষ-শয্যা রচনার জন্য ছুটে আসছে তখন কবি বলছেন:

“পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন-
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য-
যারা দান দেয় তারা মুনাফার
সাধুতার সুদ ক’ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর:
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান বাঁধা কলকাতা।”[৭]

সেই দুর্দিনে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল —

“আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।”[৮]

একদিকে এই ‘নতুন চাষের মন্ত্র’, অন্যদিকে ‘অন্নহারা বাংলা-দেশে’ যখন ‘সোনার ধান নিরুদ্দেশ’ তখন বিদেশাগত যুদ্ধের সৈনিককে সম্বোধন করে কবি বলেছেন:

“কার স্বদেশে এসেছো জেনো দূরের ভাই।
ভারতমাটির ধুলো
নীলাম্বরের আকাশতলে অরণ্যে
মনে মনেই কপালে তুলো।
অচেনা মাঠ, নদীর ঘাট, লক্ষগ্রাম, সংসারে
এখানে প্রাণ পেয়েছে পুজো,
তাকেই খুঁজো,
দেশকে পাবে আপন লোকের বুকে।”[৯]

১৩৫০এ অবিভক্ত বাংলায় মনুষ্যসৃষ্ট ভয়ঙ্করতম মন্বন্তর দেখা দিল। বাংলার এই মন্বন্তরের জন্য দায়ী যুদ্ধের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সুপরিকল্পিত লুণ্ঠন ও কৃষকহত্যার নীতি, বেপরোয়া চোরাকারবার ও মজুতদারি। এই মন্বন্তর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীরতম ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ। এর ফলশ্রুতিতে মৃত্যুর মিছিলে সামিল হতে হয়েছিল বাংলার ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, জেলে,ধান-ভানা শ্রমিকদের। কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ‘১৩৫০’ কবিতায় সেই মন্বন্তর ক্লিষ্ট বাংলার চিত্রকে বেদনার সঙ্গে ভাষা দিয়েছেন এইভাবে:

© Santiniketan Sahityapath

"হাত থেকে তার প'ড়ে যায় খ'সে
অবশ আধলা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে।
প্রাণ, তুমি আজো আছো ঐ দেহে,
আছো মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে,
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।"[১০]

এখানে কঙ্কালদেহিনী মৃত্যুপথযাত্রিনী বাংলার মেয়ের মর্মস্পর্শী রূপকল্প রচনায় কবির বাণীশিল্পটি হয়েছে অনবদ্য 'কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে'। এই দুর্ভিক্ষের অন্তরালে যে লোভ, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্র প্রতিমুহূর্তে চলছে তা কবি জানেন। তাই এর প্রত্যক্ষ চিত্র প্রকাশেও কবির দ্বিধা নেই:

"দেখো, মন,
তারি শোকচ্ছবি এই একাকী আহত কত জন।
সে যে শিশু কাঁদে একা ভিখারী ধূলায়,
সোনার দিগন্ত ধান লুণ্ঠিত গ্রামের কিনারায়।"[১১]

অন্যত্র বলেছেন,

"অন্ন আছে,
লোভের মরাইয়ে ধ্বংস গোলায় অন্ন আছে,
পণ্যরাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ।
সে-পথ বন্ধ।।"[১২]

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কবিকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে কলকাতা ও নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল পরিক্রমা করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশব্যাপী এই মূঢ়তা ও ভ্রাতৃদ্রোহের কোনো আশু সমাধান নেই। কালোবাজারী ও মার্কস্‌পন্থী উভয় প্রতিপক্ষের যুক্তি তাঁর কাছে পুরানো বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, যেমন, তিনি বলেছেন — 'ঐ কালোপন্থী কেউ টিকবে না; না, না, না, তেমনি বলেছেন 'বিরুদ্ধ সংগ্রামটাও মান্ধাতার' কারণ,

"বাঁচানো অর্থে বস্তি বাঁচানো নয়, বস্তির বস্তিত্ব
ঘুচিয়ে মানুষকে দেওয়া অস্তিত্ব;
এবং এই তীব্র সুযোগে লোভের জট কেটে শহরে
সাম্যের বিধান ফাঁদা বড়ো বহরে।"[১৩]

কবির মতে, পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে নয়, হত্যার বদলে হত্যা হেনে নয়; মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সম্ভব, গান্ধীজীর আন্দোলনের মতো সংঘবদ্ধ শক্তির অহিংস প্রতিরোধে —

"চমৎকার ছবি - আঁকিয়ে, বন্ধু, উজ্জ্বল কর্মী;
আমাদের মতো বিচিত্র জনসাধারণ মানুষধর্মী;
বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃত করুণার জিৎ,
প্রত্যহ বীর্যেই ধ্যানের ভিৎ;"[১৪]

১৯৪৮এ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর কবির স্থায়ী প্রবাসজীবন শুরু হলো। 'পালাবদল' এ দেখা দিল এক উদ্বাস্তুসুলভ অনিকেতন মনোভাব। তাঁর দৃষ্টিতে যুদ্ধবিতাড়িত ডানগিজের মেয়ে, জাতিবৈর-বিতাড়িত ইহুদি পরিবার, গৃহযুদ্ধের ফলে উদ্বাস্তু প্যানিশ বেহালাবাদক একই বেদনার সূত্রে বাঁধা পড়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের ফলে মার্কিনের একটি গ্রাম উঠে যাচ্ছে, যে কয়টি প্রাণী নীড় রচনা করেছিল 'প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে...,' তারাও হবে উদ্বাস্তু। তাই তিনি বলে উঠেন:

“… এই গ্রাম
তাহ’লে
উঠে যাবে।”[১৫]

মনে হয়, এই কয়েকটি কাটা কাটা শব্দে কবি সারা পৃথিবীর উদ্বাস্তুমনের হতাশাকে রূপ দিয়েছেন। বিভক্ত বাংলার অধিবাসীদের কাছেও এটি জীবন্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। কালবেলার সংকটকে কাব্যরূপ দেওয়ার এ এক অভিনব কাব্যশৈলী কবির। কিন্তু স্বভাবে অমিয় চক্রবর্তী শুভবাদী। তিনি মুখ্যত চিৎসত্ত কবি। সমকালের ‘ফ্যাকাশে রুগ্ন সভ্যতা’ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রেখেও তিনি মানবিকতায় আস্থা রেখেছেন। মারণযজ্ঞ যেমন চলছে প্রাদেশিকতার বেড়াভাঙা ক্ষমাহীন রণক্ষেত্রে, তেমনি বহু মানবের সীমা-সংকীর্ণতা-লুপ্ত মিলিত শক্তিতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিষ্ক্রমণের পথ। তাঁরই কথায় —

“ক্যারিবিয়ানে পশ্চিমদেশীয় নানা জাতের লোক, আফ্রিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন আরবিক সীরীয় ইত্যাদি একত্রে ভাগ্যপরীক্ষায় মিলেছে। কাউকে বাদ দিয়ে মানরক্ষা, শান্তিরক্ষা হবে না।… ক্যারিবিয়ানের দ্বীপে নতুন দীপালির সূচনা দেখে এসেছি। সব আলো জ্বলেনি। কিন্তু যেখানে যন্ত্রণার ইতিহাস দীর্ঘ ছায়া ফেলে আজও আখের ক্ষেতে, মদের কারখানায়, ধানের মাঠে, জলায়, মানুষের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে একটি নতুন প্রদীপ জ্বললে অনেকখানি আশ্বাস পাওয়া যায়।”[১৬]

কবির এই বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের রূপ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করেও তিনি আশাকে ব্যাহত হতে দিতে চান নি। বোমাবিধ্বস্ত ডুসেল ডর্ফ এ মানুষের বিপর্যয়ের মাঝেও তিনি অবিচল প্রত্যয়ে মানাবত্মার বিজয়রাণী উচ্চারণ করেছেন:

“হে প্রেয়সী, হে জননী, শিশু যতো, অচেনা স্বজন,
তোমাদেরি সর্বদেশী এসেছিলো পথিক চরণ
দূর ভারতীয়, যদি কথা-হীন ফিরে যাই
ভাইয়ে-ভাইয়ে হন্যতার পৃথিবীর অন্য নানা ঠাঁই-
মনে-মনে নতজানু জর্মানিতে জেনো বারবার
তোমাদেরি দৃষ্টি দিয়ে খুঁজি ইচ্ছা প্রাণদেবতার,
যে-প্রসাদে জয় করো বোমাভাঙা লক্ষ হাহাকার।”[১৭]

আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের নিবিড় যোগের চিহ্ন তাঁকে সর্বদাই মুগ্ধ করেছে। সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ছাড়িয়ে মানুষ মানুষের জন্য প্রীতির আশ্রয় মনের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এবং সেখানে কোনো দেশ বা জাতির বাধা মানেন নি তিনি। তাই বলেছেন:

“তরুণীর চোখে সুখ বিদেশী যাত্রীকে খেতে দিতে,
ভাই যেন এলো পৃথিবীতে,
কিসের বাজনা পথে ঘাটে-
এর মানে কিছু বুঝবো না।
এতোদিন আছি বেঁচে কিছুই জানিনি, তবু শেষে
প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে জেনেছি সমস্ত প্রাণ মেশে।।”[১৮]

এই অপরূপ প্রাণের প্রসন্নতায় তাঁর রাজনীতির ভাবনা হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক মিলনের এক অনন্য দিক। অন্তরের প্রসন্ন প্রীতিকে তিনি ভাগ করে দিয়েছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। তাই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাকে মানবনীতি ও মানবপ্রীতির মানদণ্ডে বিচার করা আবশ্যক।

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী ১৯৭৮ সালের ৪ ফেব্রুআরি ভারতবর্ষে আগত অমিয় চক্রবর্তীর কাছে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে কবির রাজনৈতিক ভাবনার সারাৎসার প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমরা ড. চক্রবর্তী ও কবির সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরতে পারি, আলোচ্য প্রসঙ্গে।

© Santiniketan Sahityapath

"প্রশ্ন: কোনো বিশেষ রাজনীতিতে কি আপনার বিশ্বাস আছে? গান্ধীর সঙ্গে আপনার তো যোগাযোগ ছিল। তাঁর কোন প্রভাব আছে আপনার লেখায়? ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্পর্কে আপনার মনোভাব বলুন।

"উত্তর: গান্ধীজীর মানবিকতাবোধ আমাকে টেনেছিলো। তাঁর একটা তীব্র স্পর্শকাতর অনুভূতির শিরা ছিলো। আশ্চর্যভাবে বহুমানুষের মধ্যে চেতনা জাগাতে পারতেন। সকলে তেমন পারে না। তাঁর অনশনের সময়ে দেখেছি রিক্‌শওয়ালা, কুলি, সন্ন্যাসী, পথের ভিক্ষুকও তাঁর জন্য উদ্বেগ বোধ করছে। আরো অনেকেই তো নানা সময়ে অনশন করেছে — এমন সার্বিক অনুভূতি দেখিনি। মমতা বোধ করার, করুণা করার প্রবল একটা শক্তি ছিলো তাঁর মধ্যে। বিবেকানন্দের মধ্যে। এ দৌর্বল্য নয়। এরই অভাবে আমরা কিছুটা নিঃসাড়; পুরোপুরি জীবিত নই। রবীন্দ্রনাথেরও এই মানুষের জন্য ভাবার দিকটা খুব ছিলো। রাশিয়ার চিঠিতে সে-কথাই আছে। প্রথাসিদ্ধ তাত্ত্বিক কমিউনিজম্ নয় তাঁর। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্য ছিলো কম। মানুষের জন্য ভাবনা ছিল বেশী।

"সাম্যবাদ সত্যই মানুষের উন্নতির পথ করেছে। কিন্তু চীন বা রাশিয়া মানুষের স্বাধীনতা দেয়নি। লোকের বাড়ি গিয়ে তাকে অপরাধ না জানিয়ে শাসন করা, শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। গান্ধী একটা মধ্যপথ চেয়েছিলেন — আপোষ নয়, অন্যায় নয়। আমেরিকার সমাজে ব্যবসাবৃত্তি বড় বেশি। ধনিক সমাজেরই সেখানে বিক্রম। এমন কি ব্যবসায়ের লাভের জন্য যুদ্ধ ঘটিয়ে তুলতেও তারা অনিচ্ছুক নয়। সেখানে উচ্চাশার অসহিষ্ণুতা সবকিছুর উপরে। একটা তৃতীয় পথ নিশ্চয়ই আছে। বিবেকের পথ, আদর্শের পথ, প্রমুক্ত সত্যের পথ।[১৯]

কবির এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি কোনো বিশেষ রাজনীতিতে আস্থাশীল না হয়ে প্রীতিময় গ্রহণশীলতায় মানুষের কথাই ভেবেছেন, মানুষের মনের সঙ্গে মনের যোগটাকেই বড়ো করে দেখেছেন মানবিক একাত্মতায়। তাই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা হয়েছে আন্তর্জাতিক চেতনারই অঙ্গীভূত একটি অনন্যদিক।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থগুলি হ'লো: 'খসড়া' (১৯৩৮), 'এক মুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২) 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযানী' (১৯৪৪), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৯), ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬), পুষ্পিত ইমেজ (১৯৬৭), অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন কবিতা' (১৯৮০)।

তথ্যসূত্র:

১। বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', 'অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, জানুআরি ১৯৫৯, পৃ. ৯১

২। সুমিতা চক্রবর্তী, 'কবি অমিয় চক্রবর্তী', জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুআরি, ১৯৮১, পৃ. ১৪৩

৩। ১৯৭৮এর ১১ মে সুমিতা চক্রবর্তীকে অমিয় চক্রবর্তী লিখিত পত্র, তথ্যটি পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত

৪। অমিয় চক্রবর্তী, 'মহাত্মা গান্ধী', 'সাম্প্রতিক', ১৯৬৩, পৃ. ২৩০

৫। অমিয় চক্রবর্তী, 'কবিতা সংগ্রহ' (১ম খণ্ড), 'যুদ্ধের খবর', 'একমুঠো', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ৬৩

৬। ওই, পৃ. ৬৮

৭। অমিয় চক্রবর্তী, 'কবিতা সংগ্রহ' (১ম খণ্ড), 'অন্নদাতা', 'ভারতী', 'পারাপার', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১১

৮। ওই, পৃ. ২১১-২১২

৯। অমিয় চক্রবর্তী, 'কবিতা সংগ্রহ' (১ম খণ্ড), 'দূরের ভাই', 'ভারতী', 'পারাপার', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১৪

১০। অমিয় চক্রবর্তী, 'কবিতা সংগ্রহ' (১ম খণ্ড), '১৩৫০', 'ভারতী', 'পারাপার', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১৩

© Santiniketan Sahityapath

১১। অমিয় চক্রবর্তী, কবিতা সংগ্রহ (১ম খণ্ড), ‘সন্দ্বীপ’, ‘ভারতী’, ‘পারাপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১৭

১২। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (১ম খণ্ড), ‘অন্ন দাও’, ‘ভারতী’, ‘পারাপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১২

১৩। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (১ম খণ্ড), ‘সত্যাগ্রহ’, ‘অভিযান’, ‘ভারতী’, ‘পারপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২২২

১৪। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (১ম খণ্ড), ‘সত্যাগ্রহ’, ‘প্রতিপক্ষ’, ‘ভারতী’, ‘পারপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২২১

১৫। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (২য় খণ্ড), ‘ইতিহাস’, ‘পালাবদল’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ৩৩

১৬। অমিয় চক্রবর্তী, ‘ক্যারিবিয়ানের চিঠি’, ‘সাম্প্রতিক’, ১৯৬৩, পৃ. ২৭

১৭। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (১ম খণ্ড), ‘ডুসেলডর্ফ, ‘য়ুরোপা’, ‘পারাপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২২৭

১৮। অমিয় চক্রবর্তী, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (১ম খণ্ড), ‘ফ্রাইবুর্গের পথে’, ‘য়ুরোপা’, ‘পারাপার’, দে’জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২৩০

১৯। সুমিতা চক্রবর্তী, ‘কবি অমিয় চক্রবর্তী’, ‘অমিয় চক্রবর্তী যা বলেছিলেন’, জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুআরি ১৯৮১, পৃ. ১৩৩-১৩৪

—

Prantik Gabeshana Patrika